UJAGAR: ISSN 0976-7398

ভাষা-সমাজভাষা সংখ্যা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক

ষোড়শ বর্ষ ❑ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪২৬

সম্পাদক
উত্তম পুরকাইত

বিদেশি শব্দের বাংলা বানান : কয়েকটি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ

শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়

প্রারম্ভিক নীতি নির্ধারণ

বাংলা বানান নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। তবে সেইসব বিতর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবর্তিত হয়েছে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের বানানকে কেন্দ্র করে। অ-বাংলা (অন্যান্য ভারতীয় ভাষার এবং বিদেশি) শব্দের বানান নির্ণয় নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধ খুব বেশি নজরে পড়ে না। অ-বাংলা শব্দের বানান প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়। লেখককে বেছে নিতে হয় যেকোনো একটি পন্থা—

১। অ-বাংলা শব্দটির উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে যতটা সম্ভব কাছাকাছি প্রকাশের চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন ঃ ফরাসি শব্দ Rimbaud-এর বানান বঙ্গাক্ষরে র‍্যাঁবো বা হ্র্যাঁবো লেখা যেতে পারে।[১]

২। শব্দটির উচ্চারণ নিয়ে ভাবিত না হয়ে তার প্রতিবর্ণীকরণের/লিপ্যন্তরের চেষ্টা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নাগরী বা অন্যান্য ভারতীয় লিপি থেকে প্রতিবর্ণীকরণের প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। রোমক লিপি থেকে লিপ্যন্তরের সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও তা এখনও সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

এই আলোচনার প্রথমাংশে আমরা লিপ্যন্তরের নিয়ম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিতর্কের ওপর আলোকপাত করব। শেষাংশে বাংলা ভাষার লিপ্যন্তরের সম্ভাব্য নিয়ম কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করা হবে। এর ফলে একদিকে যেমন লিপ্যন্তর সম্পর্কিত বিতর্কের ঐতিহাসিক রূপরেখাটির ঝলকদর্শন পাওয়া যাবে; আবার তার ওপরে ভিত্তি করে ভবিষ্যতের বাংলা বানান কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে। তবে মনে রাখা দরকার, বাংলা বানান বিতর্কের ঐতিহাসিক তালিকা-নির্মাণ আমাদের এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ফলে লিপ্যন্তর বিষয়ক নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবের ওপরেই আলোকপাত করা সম্ভব হবে। অবশ্য এই বাছাই নিতান্ত আপতিকভাবে করা হয়নি। ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের প্রস্তাবের মধ্যে যাতে ভারসাম্য থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে।

ব্যক্তিগত প্রস্তাব হিসাবে আমরা বেছে নিয়েছি সুভাষ ভট্টাচার্যের *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ*।[২] সরকারি এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির লিপ্যন্তর-বিষয়ক প্রস্তাব বিশদে আলোচনা করা হবে। এর পাশাপাশি বিশ্বভারতীর বানানবিধির ওপরেও আলোকপাত করা হবে। তবে একই সঙ্গে স্বীকার্য, এই প্রতিষ্ঠানটি বিদেশি শব্দের বানানে খুব অভিনব কোনো প্রস্তাব সংযোজন করতে পারেনি। বিশেষত রবীন্দ্র-রচনার বাংলা বানান নির্ধারণেই তারা মনোযোগ দিয়েছে। অপরপক্ষে, বাংলাদেশের সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকা বাংলা একাডেমির বানানবিধি পর্যালোচনা করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদপত্রগোষ্ঠীও বানান নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অবশ্য সমস্ত সংবাদপত্রের বানানবিধি লিখিত অবস্থায় সর্বসাধারণের জন্য প্রাপ্য নয়। সেক্ষেত্রে মুদ্রিত সংবাদপত্র থেকেই তাদের বানানের প্রবণতা আন্দাজ করে নিতে হয়। সংবাদপত্রের বানানের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন* বইটি বেছে নিয়েছি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রথম আলো সংবাদপত্রগোষ্ঠীর *প্রথম আলো ভাষারীতি* বইটি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, বানান সংক্রান্ত প্রবন্ধে বানান ও লিপির গুরুত্ব সমধিক। আমরা জ্ঞানত কোনো উদ্ধৃতির বানান পরিবর্তন করিনি। কিন্তু নিতান্ত প্রযুক্তিগত বাধ্যতার কারণেই কিছু লিপিগত পরিবর্তন করতে হয়েছে। য-ফলা আ-কারের রূপটি কোনো বর্ণের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট অবস্থায় লিখতে অপারগ হওয়ায় আমরা ক্ষেত্রবিশেষে বানান করে 'য-ফলা আ-কার' লিখেছি। পলাশ বরন পাল তাঁর বেশিরভাগ বই নিজের আবিষ্কৃত লিপিতে প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় আমরা লিপি অপরিবর্তিত রাখতে পারিনি। আর *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* নামক বইটিতে বিশেষ কিছু বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। ফ এবং ভ-এর নীচে বিন্দুচিহ্ন, জ-এর নীচে বিন্দুচিহ্ন (জ) এবং দ্বিবিন্দুচিহ্ন ইত্যাদি। আমাদের আলোচনার সময় উপযুক্ত বর্ণের অভাবে আমরা সাবস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। যেমন, $ফ_১$ এবং $ভ_১$ লেখা থাকলে যথাক্রমে ফ এবং ভ-এর নীচে বিন্দুচিহ্ন বুঝতে হবে। একইভাবে $জ_২$ বলতে জ-এর নীচে দ্বিবিন্দুচিহ্ন (ফরাসি j-এর উচ্চারণ) বুঝতে হবে। বিদেশি শব্দের বানান আমাদের মূল আলোচ্য হলেও কখনও কখনও একটি প্রতিষ্ঠানের বানান-নীতির মূলগত প্রবণতাকে বোঝার তাগিদে অ-বিদেশি শব্দের বানান সম্পর্কেও আমরা অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি।

দুই

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি বানান-নীতি

ঐতিহাসিক কালক্রমকে মর্যাদা দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিকে কেন্দ্র করে।[৩] এই বানানবিধির (১৯৩৭) অ-সংস্কৃত শব্দের

বানান সংক্রান্ত প্রথম নিয়মটিই হল—"রেফের পর ব্যঞ্জনবর্গের দ্বিত্ব হইবে না।"[৪] এই নিয়ম নিয়ে ২০১৮ সালে আর অবশ্য বিতর্কের অবকাশ নেই। ৪ সংখ্যক বিধিটি নিয়ে বরং কথা বলা যেতে পারে—

"শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না...কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন বিধেয়। ...যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন আবশ্যক, যথা—শাহ্, তখ্ত্, জেম্স্, বণ্ড্।"[৫]

আলোচনার জন্য 'তখ্ত্' শব্দটিকেই বেছে নেওয়া যাক। শব্দের উচ্চারণ খুবই সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করছে এই বানান। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে অস্বস্তির কারণ ঘটাচ্ছে হস্-চিহ্নের দু'বার ব্যবহার। এই বানান ব্যতিরেকে আর যে যে বানান হতে পারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে—

১। **তখত্/তখৎ ঃ** এক্ষেত্রে শব্দটির সঙ্গে পরিচিতি না থাকলে পাঠক ত-খত্ উচ্চারণ করবেন, এই আশঙ্কা থেকে যায়। লক্ষণীয়, ঠিক উচ্চারণের দলগঠন CVCC। দলের কোডা অংশে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশ (তাদের মধ্যে একটি আবার মহাপ্রাণ ধ্বনি/খ/) বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রবণতার অনুগ নয়। পক্ষান্তরে, ভুল উচ্চারণ ত-খত্ দলগঠনের দিক থেকে বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণের প্রবণতাকে মান্য করে—CV-CVC। ফলে আলোচ্য বানান লিখলে মূল উচ্চারণ না-জানা আনকোরা পাঠকের পক্ষে ভুল উচ্চারণ করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

২। **তখ্ত ঃ** এই বানান অন্তত তিন রকমের উচ্চারণের জন্ম দিতে পারে—তখ্-তঅ, তখ্-তো এবং অভীপ্সিত ঠিক উচ্চারণ তখ্ত্। এক্ষেত্রেও প্রথম দুটি ভুল উচ্চারণের দলগঠন (CVC-CV) বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রবণতার অনুগামী বলে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থেকে যায়।

৩। **তখত ঃ** লিপিগতভাবে সবচেয়ে সহজ। অথচ, বিভিন্ন রকমের ভুল উচ্চারণের জন্ম দিতে পারে এই বানান—ত-খত্ (CV-CVC), ত-খ-ত (CV-CV-CV), তখ্-ত (CVC-CV) ইত্যাদি।

উপরে আলোচিত তিনটি বানানের ক্ষেত্রেই দেখা গেল, ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে কি উচ্চারণ ভুলের আশঙ্কা একেবারে নিকেশ করে 'তখ্ত্' লেখাই বিধেয়? কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার হস্-চিহ্নের বাহুল্য অস্বস্তি ঘটায়। বাংলা অভিধানগুলির দিকে নজর ফেরালে এই অস্বস্তির বিষয়টি যে কল্পিত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নীচে কয়েকটি মান্য অভিধানে এই শব্দটির বানান কীভাবে লেখা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হল—

১। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ এই শব্দটির সরাসরি ভুক্তি নেই। পরিবর্তে তক্ত শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফারসি তখ্ত্-এর উল্লেখ আছে। *তখ্ত্-ই-রয়ান* বা *তখ্ত্-ই-তাউস*—এই দুটি শব্দকেও আলাদাভাবে ফারসি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।[৬]

২। সংসদ বাংলা অভিধানে তিনটি শব্দের ভুক্তি এই ক্রমে পাই—তকত, তক্ত, তখত। স্পষ্টতই, হস্-চিহ্ন বর্জনের পক্ষে সংসদের রায়।[৭]

৩। *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* জানাচ্ছে ঃ " 'তখত, 'তখৎ' নয়।"[৮]

৪। ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *আধুনিক বাংলা অভিধান* মূল শব্দ হিসাবে বানান লিখছে ঃ তখ্ত।[৯] অথচ, তক্ত শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশের সময় ফারসি শব্দটির বানান লেখা হচ্ছে ঃ তখত।[১০] মূল ফারসি শব্দের বানানেই যেখানে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে না; সেখানে বাংলায় গৃহীত ফারসি শব্দের বানানে হস্-চিহ্ন বাহুল্য বলেই মনে হয়।

৫। কাজী রফিকুল হক সম্পাদিত *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*-এ আলোচ্যমান শব্দের তিনটি বানান এই ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—তখত, তখৎ, তক্ত।[১১], যে অভিধান নিজের নামকরণে দীর্ঘ ঈ-কারের যথেচ্ছ ব্যবহার করছে (তারই সঙ্গে *ফার্সী* শব্দটির অপ্রয়োজনীয় হস্-চিহ্ন ব্যবহারের পক্ষপাতী নয়।

৬। গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান* শব্দটির তখত বানান লেখার পক্ষপাতী।[১২]

৭। রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা-য়* আলোচ্যমান শব্দটি সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে এর বাংলা রূপ তক্ত-এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সময় অভিধানকার ফারসি তখ্‌ৎ বানান লিখছেন।[১৩]

এই সাতটি অভিধানের মধ্যে কোনোটিই যে বাংলা বানানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কথিত হস্-দ্বিত্ব সমর্থন করছে না—বরং ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধিতা করছে—এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত আপতিক নয়। কলিকাতা বিশবিদ্যালয়ের পূর্বোক্ত নিয়মের (১৯৩৭) পর প্রায় আশি বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানকালে যে তখত বানানটিই অভিধান-সমর্থন পাচ্ছে; এর থেকে বোঝা যায়—ব্যাকরণই বানান নির্ণয়ের একমাত্র নির্ধারক উপাদান নয়। তখত বানানের সপক্ষে কোনো ব্যাকরণগত বা ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি নেই। নেহাত লিখন-সুবিধার কারণেই এই বানান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিকে অস্বীকার করে সমাজে মান্যতা পেল। উচ্চারণ ভুলের আশঙ্কা এখানে নাকচ হয়ে যায় সামাজিক প্রচলনের যুক্তিতে। কোনো নির্দিষ্ট শব্দের বানান-ব্যবহারকারীদের মধ্যে যদি ওই শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট প্রচলিত থাকে, তাহলে যথাযথ উচ্চারণ প্রকাশের অতিরিক্ত তাগিদে বানানকে জটিল না করাই শ্রেয়। *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* গ্রন্থের বানানও এই ত্রুটি এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেই প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

আলোচ্যমান বানানবিধির আরেকটি বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এর ১০ সংখ্যক নিয়ম—

"বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে।"[১৪]

এই নিয়ম যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। অনেকগুলি সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়—

১। বিদেশি শব্দের উচ্চারণে s কি সর্বদাই /স/ আর sh কি সর্বদাই /শ/ উচ্চারিত হয়?

২। 'মূল উচ্চারণ' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? কোনো একটি শব্দ যদি একাধিক ভাষায় থাকে এবং বিভিন্ন ভাষায় তাদের উচ্চারণ আলাদা হয়; সেক্ষেত্রে মূল উচ্চারণ বলতে কোন্ ভাষার উচ্চারণকে গ্রাহ্য করা হবে? যেমন ধরা যাক, restaurant শব্দটি লাতিন-মূল থেকে পুরোনো ফরাসি (old french) ভাষার মাধ্যমে আধুনিক ফরাসি ভাষার সূত্র ধরে ইংরেজিতে প্রবেশ করেছে।[১৫] শেষ দুটি স্তরের কথাও যদি বিবেচনা করি, ফরাসি মতে রেস্তোরাঁ লেখা হবে নাকি ইংরেজি মতে রেস্টুরেন্ট; তার কোনো দিকনির্দেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি থেকে বোঝা যায় না। এমনকি, শব্দকে বাদ দিয়ে একটি ধ্বনিমূলকেও যদি বিবেচনা করা যায়, ভাষাভেদে তার উচ্চারণ পাল্টে যায়। এই /r/-এর উচ্চারণ ইংরেজিতে প্রায় বাংলার /র/ এর মতো হলেও, ফরাসিতে তা অনেকটা /হ্র/ ধ্বনির মতো গলা থেকে উচ্চারিত (guttural r) হয়। আবার ইতালীয় এবং এসপেরান্তো ভাষায় /র/-এর উচ্চারণ অতিরিক্ত কম্পিত (trilled)।

৩। নিছক লোকপ্রচলিত অভ্যাস ব্যতিরেকে 'খ্রীষ্ট' বানানটিকে মান্যতা দেওয়ার আর কী বা অর্থ হয়?

লোকপ্রচলনের কাছে পরাজয় স্বীকার করার এবম্বিধ দৃষ্টান্ত অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে অপ্রতুল নয়। আলোচ্যমান বিধির অব্যবহিত আগেই ৯ সংখ্যক নিয়মে জানানো হয়েছে—

"হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা।"[১৬]

বিকল্পাত্মক উভয় বানানকেই যদি বিধেয় বলে মান্যতা দেওয়া হয়, তাহলে তো বানানবিধি প্রণয়নের আগে ও পরে বানান পরিস্থিতি একই থেকে যায়। সাহসিকতার অভাবে বিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়। ণ এবং ন সম্পর্কিত বিকল্পাত্মক বানানের ক্ষেত্রেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একই রকমের দ্বিধার পরিচয় দিয়েছে—"অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে... কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে।"[১৭] পূর্বোক্ত বিধির ত্রিবিন্দুচিহ্নের আগে ও পরের বাক্যাংশ প্রায় পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়।[১৮] পরস্পরবিরোধের এখানেই শেষ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ সংখ্যক নিয়মের উদাহরণ ব্যাখ্যা করতে "ওঅর-বণ্ড' শব্দটিকে বিধেয় বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আবার কিছু আগেই ৪ সংখ্যক নিয়মে হস্-চিহ্নের ব্যবহার বোঝাতে গিয়ে 'বণ্ড্' বানানকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিকভাবে ১৪ সংখ্যক নিয়মটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। বক্র আ বা বিকৃত এ (/æ/ধ্বনি) বোঝাতে শব্দের আদিতে 'অ্যা' এবং শব্দমধ্যে য-ফলা আ-কার ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই বিধি প্রায় সর্বজন-প্রচলিত হলেও অন্তত দু'জন ব্যতিক্রমী চিন্তক /æ/ ধ্বনি প্রকাশের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধির

বিকল্প কোনো পথের সন্ধান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শব্দের আদিতে ব্যবহৃত এ-কারের মাত্রা বর্ধিত করে ব্যঞ্জন-সংশ্লিষ্ট /æ/ ধ্বনি প্রকাশের প্রচলন করেন। অদ্যাবধি, বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে এই বিধি পালিত হয়। এই রীতির সুবিধা হল অভীপ্সিত ধ্বনির সঙ্গে যে /আ/ধ্বনি অপেক্ষা /এ/ ধ্বনির সম্পর্ক নিকটতর, তা এই বানান থেকে বোঝা যায়। /æ/সম্মুখ নিম্নমধ্য স্বরস্বনিম। /এ/ সম্মুখ উচ্চমধ্য স্বরস্বনিম। অন্যদিকে, /আ/ কেন্দ্রীয় নিম্ন স্বরস্বনিম। ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে /æ/ ধ্বনির বানান /এ/ ধ্বনির কোনো রকমফের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত।[১৯] ধ্বনিতাত্ত্বিক এই সমস্যার পাশাপাশি স্মর্তব্য, শব্দমধ্যে য-ফলা আ-কার ব্যবহারের এই নিয়ম কেবল বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে। তৎসম শব্দের কথা যদি বাদও দেওয়া যায়, তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে এই বানান লেখার স্বাধীনতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে না। 'ম্যান' লেখা যাবে অথচ 'ধুলোখ্যালা' লেখা যাবে না—এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কোথায়? তাহলে কি বিশ্বভারতীর নীতিই গ্রহণীয়? সেখানেও কিন্তু সমস্যার অবকাশ রয়েছে। বিশ্বভারতীর নীতির মূল সীমাবদ্ধতা হল, শব্দমধ্যে /এ/ এবং /æ/ ধ্বনির উচ্চারণের পার্থক্য এ-কারের বর্ধিত মাত্রা দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয়।

আমাদের মতে, এই সমস্যার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান মেলে পলাশ বরন পালের নিজস্ব বানানবিধিতে।[২০] তিনি স্বনিম হিসাবে শব্দের শুরুতে /æ/-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য 'পেট-কাটা এ' লিখে থাকেন। আর ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় /æ/-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য এ-কারের মাঝখানে একটি অনুভূমিক দাগ দেওয়ার (পেট-কাটা এ-কার) পক্ষপাতী। এর ফলে শব্দমধ্যে /e/ এবং /æ/ ধ্বনির উচ্চারণ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ থাকে না। একই সঙ্গে উল্লেখ্য, /এ/ ধ্বনির সঙ্গে /æ/ ধ্বনির নিবিড় সম্পর্কের আভাসও এখানে রক্ষিত হয়েছে। যুক্তির দিক থেকে নিশ্ছিদ্র হওয়া সত্ত্বেও একক ব্যক্তির তৈরি বিধি বলেই বোধহয় এই 'পেট-কাটা এ-কার' লেখার প্রবণতা সমাজে এখনও মান্যতা পায়নি।

তিন

বিশ্বভারতীর বানানবিধি

বাংলা বানানবিধি নির্মাণের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম। এই বানানবিধি খুঁটিয়ে নজর করলে আরও কিছু আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে আমরা কেবল মূলগত সমস্যাগুলির কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস হিসাবে এরপর আমরা বিশ্বভারতী প্রকাশিত *বানান ও বিন্যাস-বিধি* সম্পর্কে আলোচনা করব। ১৯ জুন, ২০১২ সালে বিশ্বভারতী

গ্রন্থনবিভাগে বাংলা বানান সম্পর্কিত একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। এই কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ১৪২২ বঙ্গাব্দে (২০১৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। এর প্রায় ২০ বছর আগেই (১৫ নভেম্বর, ১৯৯৫) প্রকাশিত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান সম্পর্কিত সুপারিশপত্র। তবু বর্তমান আলোচনায় আমরা কালানুক্রম লঙ্ঘন করে বিশ্বভারতীর বিধিই আগে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলাম। কারণ, আমাদের মতে, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর এই বিধি কিয়দংশে ভাষাতাত্ত্বিক রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছে। সেই হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধির পরেই এর আলোচনা হওয়া সংগত। ভাষাতাত্ত্বিকভাবে সর্বাধুনিক বিধি হিসাবে সর্বশেষে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বিধি আলোচিত হবে। বস্তুত প্রাতিষ্ঠানিক বানানবিধি হিসাবে বিশ্বভারতীর বিধিই আমাদের কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছে।

বিশ্বভারতী ব্যতিরেকে আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই কি কেবল একজন লেখকের জন্য একরকম বানান, অন্য লেখকদের জন্য অন্যরকম বানান—এবম্বিধ বিধি প্রণয়ন করেছে? আবার একজন লেখকের একটি বইয়ের ক্ষেত্রে একরকমের বানান মান্য, তাঁরই অন্য বইয়ের ক্ষেত্রে অন্যরকমের বানান মান্য—এরকম 'বিধি'র দৃষ্টান্তও এই পুস্তিকায় মেলে বই-কি! এই বিধির উদ্দেশ্যজ্ঞাপক দুটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল—

১। '...আধুনিকতার সঙ্গে প্রচলিত বিন্যাসের সম্ভাব্য বিরোধ বা অসামঞ্জস্য যথাসম্ভব পরিহার সম্পর্কেও সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।'

২। '...রবীন্দ্ররচনার ক্রেতা ও গ্রাহকদের কাছে প্রজন্ম-পরিচিত রূপরীতির ক্ষেত্রে কোনো আকস্মিক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, প্রকাশনা পরম্পরায় যে ধারাবাহী প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও মান স্থাপনা করেছে, তার হেরফের, যাতে পাঠক-প্রকাশক সম্পর্কে কোনো দূরত্ব না তৈরি করে, সেদিকেও সাবধানতা অবলম্বনীয়।'[২১]

কার্যক্ষেত্রে অবশ্য আমরা লক্ষ করি, পূর্বোক্ত দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কখনও বিরোধ উপস্থিত হলে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিই প্রাধান্য পাচ্ছে। এই বিধিতে বারবারই 'রবীন্দ্রনাথ-অনুমোদিত', 'কবি-কর্তৃক অনুমোদিত', 'রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত' ইত্যাদি শব্দবন্ধ ঘুরেফিরে আসবে। কয়েকটি মূলগত অসংগতির প্রসঙ্গ নীচে উল্লেখ করা হল—

১। 'সাধারণভাবে, অ-তৎসম শব্দে, প্রচলিত দেশজ ও বিদেশি, বা কৃতঋণ বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে, ঈ-কার ই-কারে ঊ-কার উ-কারে পরিবর্তিত হবে। ...কাহিনী অ-তৎসম হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থনাম এবং গ্রন্থমধ্যে অপরিবর্তিত। ...দেশি বিদেশি স্বদেশি চলবে। তবে, বিদেশিনী বানান অপরিবর্তিত থাকবে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-তে।'[২২] স্বাভাবিকভাবেই, এই ব্যতিক্রমপ্রবণ বিধি ১৮ সংখ্যক টীকায় উল্লিখিত সমীর সেনগুপ্তের মন্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেকগুলি সংশয় মনে উদিত হয়—

ক। কেন অ-তৎসম শব্দ হিসাবে 'কাহিনি' বানান গ্রহণযোগ্য নয়? গ্রন্থনামে বানান পরিবর্তন ঐতিহ্যের খাতিরে স্বীকৃত নাও হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে 'কাহিনী' কেন লেখা

হবে? এই ব্যতিক্রম-আকীর্ণ বিধি আরও একটু জটিল হয়ে যায়, যখন আমরা পুস্তিকার শেষে সংকলিত 'কিছু প্রশ্ন ও উত্তর' নামের অংশটির দিকে নজর ফেরাই।[২৩] সেখানে ঘোষিত বিধি এইরকম— 'কাহিনি। [কিন্তু *কথা ও কাহিনী*, *কাহিনী* রবীন্দ্র-গ্রন্থ নামে অপরিবর্তনীয়]।' রবীন্দ্রনাথ-লিখিত গ্রন্থনামে অপরিবর্তনীয়তার নির্দেশ ইঙ্গিত করে যে, 'কাহিনী' বানান গ্রন্থমধ্যে পরিবর্তনীয় এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে অন্যান্য লেখকদের ক্ষেত্রে গ্রন্থনামেও পরিবর্তনীয়। না হলে এই রবীন্দ্র-গ্রন্থ নামে' শব্দবন্ধটির ব্যবহার বাহুল্য হয়ে যায়। অথচ, অব্যবহিত আগের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি, বিশ্বভারতীর বানানবিধির প্রথম বিধিতেই রয়েছে, কাহিনী 'গ্রন্থমধ্যে অপরিবর্তিত'। এই সংশয়ের মীমাংসা বিশ্বভারতীর বানান-পুস্তিকা থেকে পাওয়া যায় না।

খ। বিশ্বভারতী জানাচ্ছে, রবীন্দ্র-রচনাবলিতে 'বিদেশিনী' বানানই রাখা হবে। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু সহজেই অনুমেয়, এই সংস্থা থেকেই প্রকাশিত অন্য লেখকদের বইয়ে কিন্তু 'বিদেশিনী' বানান রক্ষিতব্য নয়। লেখকের পরিচয় অনুযায়ী বানানবিধি পালটে যাওয়া কতদূর সংগত?

গ। রবীন্দ্রনাথের লেখায় কেবল 'বিদেশিনী' শব্দেই কি স্ত্রী-লিঙ্গার্থক ইনী প্রত্যয় ব্যবহৃত হবে? অন্য স্ত্রী-লিঙ্গার্থক শব্দের ক্ষেত্রে ইনী নাকি ইনি কোন্ প্রত্যয় ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া নেই।

ঘ। আবলি অভিধান-স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' বানান কেন?

২। আমাদের মন্তব্যে খ-চিহ্নিত সংশয় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশ্বভারতীর বানানবিধির ৫ সংখ্যক নিয়ম দেখলে—'রবীন্দ্রগ্রন্থে খৃষ্ট বানান রক্ষিত হবে, অন্যক্ষেত্রে খ্রিস্ট, খ্রিস্টাব্দ সিদ্ধ।'[২৪] লেখকের পরিচয় অনুযায়ী বানানবিধি বদলে যাওয়ার সেই দৃষ্টান্ত আরও একবার খুঁজে পাওয়া গেল।

৩। এর পরের ধাপে আমরা লক্ষ করব, এমনকি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও একাধিক সংরূপের (genre) ক্ষেত্রে একাধিকরকম বানানের সুপারিশ করা হচ্ছে। যেমন ধরা যাক, একই শব্দের বানান কবিতায় ও গানে পালটে যাচ্ছে! ১০ সংখ্যক বিধিতে বলা হচ্ছে—'গানে ঐ স্থানে ওই। কিন্তু কবিতায় 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' সিদ্ধ।' অন্য রবীন্দ্র-কবিতার ক্ষেত্রেও ঐ কি বিধেয়, নাকি ওই; তা বলা হল না। যেমন, *খেয়া* কাব্যগ্রন্থের *শেষ খেয়া* কবিতায় 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই/ঐ ছায়া' কোন্ বানানে লেখা হবে? গল্প-উপন্যাস কিংবা নাটকের ক্ষেত্রেই বা কোন্ বানান লিখিতব্য?

৪। সংরূপগতভাবে বানানের অসংগতি দেখানোর পরে লক্ষণীয়, একই সংরূপের মধ্যেও এমনকি বিভিন্ন ছন্দ অনুসারে একই শব্দের একাধিক বানান সুপারিশ করা হচ্ছে! ১৬ সংখ্যক নিয়মে জানানো হচ্ছে—'রবীন্দ্রকবিতায় সংস্কৃত মাত্রারীতির ছন্দে এস' জাগ' কর' ইত্যাদি শব্দে যেখানে ইলেক বা উর্ধ্ব কমা আছে ('এস' দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা') সেখানে উর্ধ্বকমা সংস্কৃত ছন্দরীতির বাধ্যতাজনিত, সুতরাং অপরিবর্তিত থাকবে।'

সংস্কৃত ছন্দের কারণে বাংলা বানান পরিবর্তিত হচ্ছে—এই যুক্তিও বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া মুশকিল। ছন্দশাস্ত্র ধ্বনির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। শেষপর্যন্ত, কানের সঙ্গে এর সম্পর্ক; চোখের তথা দৃশ্যমান লিপির সঙ্গে নয়। এটি রবীন্দ্রনাথের বদলে সত্যেন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবির সংস্কৃত ছন্দনির্ভর কবিতার বানান হলে, তাঁদের জন্য বিশ্বভারতী এই পরিমাণে ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দিত কি না সন্দেহ।

৫। শব্দের শুরুতে এ-কারের বর্ধিত মাত্রা দিয়ে ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট /æ/ উচ্চারণ বোঝানোর রীতি বিশ্বভারতীর বানানবিধির একটি মৌলিক লিপিকৌশলগত বৈশিষ্ট্য। এই প্রবণতার সমস্যা কোথায় তা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

৬। এই বানানবিধির ১৭ সংখ্যক নিয়মে বিদেশি শব্দের লিপ্যন্তর সম্পর্কিত প্রাথমিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—'বিদেশি শব্দের বানান যথাসম্ভব মূলানুগ হবে; প্রয়োজনে পাশে বন্ধনী-মধ্যে মূল শব্দটি ছাপা যেতে পারে।' এতই সংক্ষিপ্ত এই নির্দেশ, এর থেকে বানান সম্পর্কিত প্রায় কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না। মূলানুগ মানে কী? বিশ্বভারতী কি ইংরেজি /f/-এর যথাযথ মূলানুগ উচ্চারণ বোঝাতে ফ় লিখতে প্রস্তুত? কিংবা বুদ্ধদেব বসু যেমন ফরাসি /j/-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য জ় লিখতেন, পলাশ বরন পাল যেমন পূর্বোক্ত /j/-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য ঝ় লিখে থাকেন; বিশ্বভারতী কি 'যথাসম্ভব মূলানুগ' হতে গিয়ে এইসব বিশেষ বর্ণ ব্যবহার করতে রাজি আছে? একটি শব্দ যখন একাধিক ভাষার পথ পরিক্রমা করে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে, তখন তার 'মূল' উচ্চারণ নির্ণয় করাও কিছু মুশকিল হয়ে পড়ে। বর্তমান নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'রেস্তোরাঁ' শব্দটির মূল উচ্চারণ প্রসঙ্গে বিতর্কের উল্লেখ আমরা করেছি।

এখনও পর্যন্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বভারতীর বানানবিধিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির মতোই কিয়দংশে রক্ষণশীলতার পথে হেঁটেছে। উভয় বানানবিধির মূল সমস্যা ঃ অজস্র ব্যতিক্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে লোকপ্রচলিত অভ্যাসকে লঙ্ঘন করতে পারেনি, বিশ্বভারতীও রাবীন্দ্রিক বানানের বেড়াজালে আবদ্ধ। বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে আবার অতিরিক্ত সমস্যা, লেখকের পরিচয়, সাহিত্যের সংরূপ এবং ছন্দ অনুযায়ী বানান পালটে যাওয়ার প্রবণতা। শেষপর্যন্ত উল্লেখ্য, এই রক্ষণশীলতার সমস্যা সম্পর্কে বিশ্বভারতীর বানানবিধি প্রণেতারা যে অসচেতন, তা কিন্তু নয়—

"সর্বাত্মক বানান-সংস্কারের মধ্যবর্তী পর্বে একাধিক ক্ষেত্রে এই আপোষমূলক মানরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহু আলোচনা ও মতামত-বিনিময়ের ফলে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে।"[২৫]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের পর প্রায় আশি বছর অতিক্রান্ত। এই মধ্যবর্তী পর্ব আর কতদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়, সেইটুকু শুধু কৌতূহল।

চার

আকাদেমি এবং একাডেমি

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক বানান-নীতির সর্বাধুনিক রূপ পাই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধিতে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বানান সংক্রান্ত একটি ভিত্তিপত্র প্রকাশ করে। এই ভিত্তিপত্র কিছুটা সংশোধন করে ১৯৯৫ সালের ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয় *বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ* নামাঙ্কিত সুপারিশপত্র। এরপর ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সালে আকাদেমির উদ্যোগে বানান ও লিপি বিষয়ক একটি আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। এই আলোচনাসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কিছু পরিমার্জনের পর আকাদেমির তরফে *বাংলা বানানবিধি* নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে। বাংলা বানান সংস্কারের সুদীর্ঘ ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন ড. মিতালী ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন* নামক বইতে।[২৬] আকাদেমির বানানবিধি ১৯৯৭ সালের পরেও ক্রমশ পরিমার্জিত হয়েছে। সেই পরিবর্তনের কালানুক্রমিক ইতিহাস আমাদের বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্বভারতীর বানানবিধির তুলনায় আকাদেমির বানানবিধির মূলগত প্রবণতা কীভাবে আলাদা হয়ে গেল, তা আমরা পূর্বোক্ত সুপারিশপত্রের ভিত্তিতে আলোচনা করব।

প্রথমেই নজরে পড়ে, এই সুপারিশপত্রকে সাজানো হয়েছে আলাদা তিনটি অংশে—লিপি বিষয়ক প্রস্তাব, বানানবিষয়ক প্রস্তাব এবং লিখনরীতিবিষয়ক প্রস্তাব। এর আগের দুটি বানানবিধিতেই কিন্তু লিপি সংক্রান্ত প্রস্তাব কিঞ্চিৎ উপেক্ষিত হয়েছিল। বিধি প্রণেতাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মান্য বানান নির্ধারণ। যুগোপযোগী লিপি নির্মাণে তাঁরা ততটা ভাবিত ছিলেন না। /æ/ ধ্বনি বোঝাতে আকাদেমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই 'অ্যা' লেখার পক্ষপাতী।[২৭] এই স্বরস্বনিমের চিহ্ন হিসাবে য-ফলা আ-কার ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি থাকা সত্ত্বেও সম্ভবত প্রচলনসিদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই 'এ্যা' লেখার প্রস্তাব আকাদেমির কাছে মান্যতা পায়নি।

২.৪০ সংখ্যক সুপারিশে বলা হচ্ছে ঃ "তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ৎ বর্ণটি অপরিহার্য।" কেন অপরিহার্য, তার সপক্ষে কিন্তু কোনো যুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। নাগরী লিপিতে ৎ ছিল না। তাহলে বঙ্গাক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে ৎ থাকার প্রয়োজনীয়তা কী? বরং 'ত্' বর্ণটি ব্যবহার করলেই তা নাগরী লিপির অধিকতর নিকটবর্তী হত। অবশ্য এইটুকু রক্ষণশীলতার কথা বাদ দিলে, ত/ৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আকাদেমির সুপারিশপত্র যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে। যেমন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বোক্ত ১৯৩৭ সালের বানানবিধির ১০ সংখ্যক নিয়মে বিদেশি শব্দ হওয়া সত্ত্বেও 'শরবৎ' লেখার নির্দেশ দিয়েছে। পক্ষান্তরে, আকাদেমি ২.৪০ সংখ্যক সুপারিশে 'শরবত' লেখার প্রস্তাব দিচ্ছে।

এমন কিছু অ-তৎসম শব্দ রয়েছে, যাদের দৃশ্যগতভাবে সমতুল্য তৎসম শব্দের উচ্চারণ এবং অর্থ আলাদা। যেমন, তাত (<তপ্ত, হসন্ত উচ্চারণ) এবং তাত (খুল্ল—); সংগত (<সংগতি, তবলার—, হসন্ত উচ্চারণ) এবং সংগত (মানানসই/উচিত অর্থে ব্যবহৃত)। এইসব ক্ষেত্রে অর্থবিভ্রাটের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আকাদেমি উভয় শব্দের ক্ষেত্রেই ত-বর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছে। ব্যতিক্রমীভাবে কেবল দু'ধরনের অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ৎ ব্যবহারের সুপারিশ করা হচ্ছে।

১। আকাদেমির মতে ধন্যাত্মক শব্দে ৎ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, পৎপৎ, কপাৎ, কিৎকিৎ ইত্যাদি।

২। কয়েকটি বিদেশি শব্দেও ৎ ব্যবহারকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। যেমন, জুজুৎসু, নাৎসি, পিৎসিকাতো, মিৎসুবিশি।[২৮]

উচ্চারণ বোঝানোর আত্যন্তিক তাগিদ থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দে ৎ ব্যবহারের নির্দেশ, তা বোঝা যায়। কিন্তু বিদেশি শব্দে ত-বর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ চারটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করার সার্থকতা কী? আকাদেমি এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। আমরা এর কারণ অনুমান করার চেষ্টা করেছি মাত্র। লক্ষণীয়, চারটি ব্যতিক্রমী শব্দের কোনোটিই ইংরেজি নয়। জুজুৎসু এবং মিৎসুবিশি জাপানি শব্দ। নাৎসি জার্মান শব্দ। পিৎসিকাতো ইতালীয় শব্দ। চারটি শব্দই গড়পরতা বাঙালির কাছে ইংরেজি অপেক্ষা অপরিচিত। তাই হয়তো উচ্চারণ ভুলের সম্ভাবনা একেবারে নিকেশ করতে ব্যতিক্রমীভাবে ৎ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপের আরও কিছু নিদর্শন এই সুপারিশপত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। ১০ সংখ্যক নিয়মে 'অতৎসম শব্দে ঈ-কারকে যথাসম্ভব বর্জন করাই সংগত' ঘোষণার পরেও প্রচলনের কারণে চীনা, নীলা, হীরে ইত্যাদি বানানকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এই সুপারিশপত্রের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অবশ্য আকাদেমি এই দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ব্যতিক্রমের তালিকা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করবে। ই এবং ন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতে যতটুকু দ্বিধা ছিল, আকাদেমির সুপারিশে তা কাটিয়ে ওঠা গেছে। বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ণত্ব এবং ষত্ব বিধান কার্যকর হবে না; আর এক্ষেত্রে সর্বত্র ই ব্যবহার করতে কোনো দ্বিধা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধির সঙ্গে প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে ঢাকার বাংলা একাডেমি নির্দেশিত বানানবিধির। আলাদাভাবে সেই বানানবিধি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব না। তবে অন্তত দুটি অসংগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে—

১। 'হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে' বলে জানাচ্ছে একাডেমি। ধ্বন্যাত্মক শব্দেও হস্- চিহ্নের ব্যবহার সাধারণত করা হচ্ছে না। যেমন, কলকল, ঝরঝর, ফটফট ইত্যাদি। কিন্তু আবারও ভুল উচ্চারণের আশঙ্কায় কিছু ব্যতিক্রমকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। যেমন, উহ্, বাহ্ যাহ্।[২৯] আমাদের মতে, উহো আহো যাহো উচ্চারণে কোনো বাংলা শব্দ হয়

না। তাই ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা এখানে নিতান্ত কম। তার থেকে বরং অনেক বেশি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা ছিল হসন্ত-প্রবণ সংগত বা তাত উচ্চারণের ক্ষেত্রে। কারণ, সেক্ষেত্রে একই বানানের ভিন্নার্থক ও-কারান্ত উচ্চারণের শব্দ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তা সত্ত্বেও যদি ওইসব শব্দের ক্ষেত্রে হস্‌-চিহ্ন ব্যবহার উপেক্ষা করতে পারে; ঢাকার বাংলা একাডেমিও এই তিনটে ব্যতিক্রম অন্তর্ভুক্ত না করলেই ভাল হত।

২। ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিদেশি শব্দে বিকল্পে য-বর্ণ ব্যবহারকে মান্যতা দিচ্ছে একাডেমি। যেমন, আযান, ওযু, নামায, রমযান ইত্যাদি। ধর্মের ভিত্তিতে শব্দের বানান পালটানোর প্রস্তাব কতদূর সংগত তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়।[৩০]

সামগ্রিকভাবে বাংলা একাডেমির বানানবিধিতে অল্পবিস্তর সংশোধনের সুযোগ থাকলেও আধুনিক যুগের সাপেক্ষে ব্যবহার্য বানানবিধি হিসাবে এর গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার্য।

পাঁচ

আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রথম আলো, সাহিত্য সংসদ

ভাষার মান্যায়ন বা প্রমিতকরণ নামক প্রক্রিয়াটি কেবল সরকারি তথা রাষ্ট্রিক পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারাই যে নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন নয়। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও মান্যায়নকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারে। যেমন, গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। লক্ষ লক্ষ পাঠক প্রত্যেকদিন সকালে সংবাদপত্রের বানান চোখের সামনে দেখেন। প্রভাবিত হন সেই বানান দ্বারা। প্রচার-সংখ্যার নিরিখে সীমান্তের এপার-ওপার থেকে দুটি সংবাদপত্র আমরা বানান বিষয়ক আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি। *আনন্দবাজার পত্রিকা* এবং *প্রথম আলো*। বস্তুত, 'সংবাদপত্র' শব্দটি ব্যবহার করলেও দুটিই আসলে বৃহৎ সংবাদপত্র- গোষ্ঠী। আমাদের জ্ঞানমতে, বাংলা ভাষার কেবল এই দুটি সংবাদপত্র-গোষ্ঠীরই নিজস্ব বানানবিধি লিখিত পুস্তকরূপে পাওয়া যায়।

প্রথমে বলা যাক *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র বানানবিধির কথা। এক্ষেত্রে আমাদের মূল অবলম্বন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন* এবং সুভাষ ভট্টাচার্য লিখিত *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* নামক বইদুটি। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, সংবাদপত্রের বানান নির্ধারিত হয় তাৎক্ষণিকতার ভিত্তিতে। দ্রুত এবং নির্ভুল সংবাদ পরিবেশনই সেখানে মূল লক্ষ্য। অভিধানের চেয়েও কার্যকালে বানান নির্ধারণে সাংবাদিকের বড়ো সহায় হয়ে ওঠেন অভিজ্ঞ সহকর্মীরা। বানানবিধির সংস্করণ হতে বছরের পর বছর সময় লেগে যায়। সংবাদপত্রের বানান কিন্তু তার থেকে অনেক দ্রুতগতিতে পালটে যায়। ফলে এই দুটি বইয়ের সঙ্গে ২০১৮ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র বানান হুবহু না মেলাই স্বাভাবিক। তারই সঙ্গে উল্লেখ্য, একটি সংবাদপত্রগোষ্ঠীর মালিকানাভুক্ত বিভিন্ন প্রকাশনীর মধ্যেও বানানের অল্পবিস্তর ফারাক লক্ষ করা যায়।

যেমন, আলোচ্যমান সংবাদপত্রগোষ্ঠীর অন্তর্গত *দেশ* পত্রিকা আর *এবেলা* সংবাদপত্র একই বানানবিধি অনুসরণ করে না। সংবাদপত্রের সাধারণ পাঠককুল, সংবাদ শিরোনামের দৃষ্টিগত নান্দনিকতা ইত্যাদি কারণেই বোধহয় *এবেলা* সংবাদপত্র z-এর উচ্চারণ বোঝাতে জ বর্ণটি প্রায় ব্যবহার করে না। অন্যদিকে বিদগ্ধসমাজ যার উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী সেই *দেশ* পত্রিকা যে অত্যন্ত নিষ্ঠভাবে জ-বর্ণটি ব্যবহার করবে, সেটাই প্রত্যাশিত। এছাড়াও অ-বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে *আনন্দবাজার* গোষ্ঠীর যে-সব মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তা নীচে উল্লেখ করা হল—

১। অ-বাংলা উত্তর ভারতীয় স্থান নাম ও ব্যক্তি নামের ক্ষেত্রে নাগরী লিপিতে সেইসব নাম যেভাবে লিখিত হয়, তদনুযায়ী বাংলা অক্ষরে লিপ্যন্তর করা হবে।

২। দক্ষিণ ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে লিপ্যন্তরের প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ মজাদার—"সে-ক্ষেত্রে সমস্যার নিরাকরণের জন্য দক্ষিণ ভারতীয় সহকর্মীদের সাহায্য গ্রহণ সংগত হবে।"[৩১]

৩। ভারতীয় নানা প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলা লিপিতে পাওয়া না গেলে নাগরী লিপিতে লভ্য বানান অনুযায়ী বাংলায় লিপ্যন্তর করা হবে।

৪। চিনা নামের লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রে পাইনিয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।[৩২]

বস্তুতই উপর্যুক্ত চারটি বিধির প্রথম দুটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নাগরী লিপির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পক্ষপাত দর্শাতে গিয়ে বাংলা লিপির নিজস্ব ধর্ম ক্ষুণ্ণ করা কতদূর সংগত? যেমন ধরা যাক, *আনন্দবাজার* -কর্তৃপক্ষ লিখে থাকেন গাঁধী। কিন্তু নাগরী লিপিতে বিন্দুচিহ্ন আর বাংলায় চন্দ্রবিন্দু তো সর্বদা সমান নয়। নাগরীতে স্পর্শবর্ণগুলির পঞ্চম বর্ণের যে কোনো একটিকে বোঝাতে পারে বিন্দুচিহ্ন। তার পরিবেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে কোন্ বর্ণটিকে বোঝানো হচ্ছে। নাগরী লিপিতে ত-বর্গের অন্তর্গত ধ-এর মাথায় বিন্দুচিহ্ন ব্যবহার করলে বাংলা লিপ্যন্তরের সময় বিন্দুচিহ্নের জায়গায় ত-বর্গের অন্তিম বর্ণ ন-এর ব্যবহার হওয়াই স্বাভাবিক। গাঁধী বা মাঁকড় গোত্রের বানান (গান্ধী বা মানকড়ের বদলে) অতিরিক্ত নাগরী নির্ভরতার শোচনীয় পরিণাম।[৩৩]

স্থাননামের ক্ষেত্রেও নাগরী অনুযায়ী 'বিশুদ্ধ' বানান লেখার প্রবণতা বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রবৃত্তির বিপরীত এক যাত্রা শুরু করেছে। যেমন, গ্বালিয়র বানানটি হয়তো নাগরী লিপির সাপেক্ষে 'বিশুদ্ধ' হল, কিন্তু এর উচ্চারণ কীরকম? শব্দের শুরুতে ব-ফলা বাঙালি জিহ্বা উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত নয়। যেমন, স্বরবর্ণ, ত্বরান্বিত। তাহলে স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ /galior/ হওয়া উচিত। এর বদলে চেনা উচ্চারণ-দ্যোতক বানান গোয়ালিয়র রাখাই সংগত বলে মনে হয়। অধ্যাপক পবিত্র সরকার জানাচ্ছেন, অজিণ্ঠা বা পটনাও বাঙালির দীর্ঘকালের উচ্চারণ অভ্যাসের সঙ্গে মানানসই নয় (৩৩ সংখ্যক তথ্যসূত্র)। তার বদলে অজন্তা বা পাটনা বানানগুলিকে বাংলা শব্দ হিসাবে গ্রহণ করলে ক্ষতি কী?

বাংলাদেশের *প্রথম আলো* সংবাদপত্রগোষ্ঠীর বানান-নীতি অবশ্য *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র মতো এতটা নাগরী-নির্ভরতা দেখায়নি। বরং বানান-নীতির দিক থেকে ঢাকার

বাংলা একাডেমির সঙ্গে তাদের নৈকট্য বেশি। মূল বানান-প্রবণতা হরেদরে এক হলেও *প্রথম আলো*-র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কেবল নীচে উল্লেখ করা হল—

১। 'বিদেশি শব্দে বা নামে যুক্তাক্ষর যথসম্ভব ভেঙে লেখার চেষ্টা করতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, তা যেন দৃষ্টিকটু না হয়।'[৩৪] দৃষ্টিগত নান্দনিকতা কোনো ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ধারণা নয়। বানানবিধিতে এরকম বিমূর্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি না হওয়াই শ্রেয় বলে আমাদের মনে হয়। *প্রথম আলো*-র কাছে 'পেনশন' গ্রহণযোগ্য, অথচ 'লনডন' গ্রহণযোগ্য নয়। এই দৃষ্টি-নান্দনিকতার ধারণা নিতান্ত আপতিক এবং তা শেষপর্যন্ত বানানবিধিকে অস্পষ্ট করে তোলে মাত্র।

২। আর্টিক্যাল হিসাবে ব্যবহৃত হলে a-কে 'আ' লেখা হবে।[৩৫] এই বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে অভিনব। আর কোনো বানানবিধিতেই আমরা a-এর মান্য উচ্চারণ অন্তর্ভুক্ত হতে দেখিনি। অথচ, ইংরেজি থেকে লিপ্যন্তরের সময় এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩। ইংরেজি বানানে যেখানে শব্দান্তে cs রয়েছে, সেখানে বাংলায় 'কস'; আর যেখানে x রয়েছে সেখানে 'ক্স' লিখতে হবে। যেমন, ইলেকট্রনিকস; কিন্তু সিক্স।[৩৬] বাংলায় বিদেশি শব্দ লেখার সময় মূল উচ্চারণের ভিত্তিতে যথাসম্ভব কাছাকাছি বানান লেখা হয়। অর্থাৎ, পদ্ধতিটি ধ্বনিগত। দৃশ্যগত নয়। ধ্বনিকে উপেক্ষা করে রোমক লিপি থেকে বঙ্গাক্ষরে লিপ্যন্তরের নিয়ম বানিয়ে জটিলতা বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই।

দেখা যাচ্ছে, *প্রথম আলো*-র বানানরীতি খুব বেশি উচ্চাশী নয়। লোকসমাজের অভ্যাসের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই তাঁরা এগোতে চান। ফলে খুব বেশি মৌলিক কোনো প্রস্তাব এই বিধিতে সংযোজন করা হয়নি।

অ-সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে সর্বশেষে আমরা যে সংস্থার কথা আলোচনা করব, সেটি অবশ্য কোনো সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান নয়। নিছকই একটি প্রকাশনী সংস্থা। কিন্তু মান্য অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* অবশ্য ভবিষ্যতে ততটা মান্যতা পাবে কি না সন্দেহ রয়েছে। সংক্ষেপে এই বইয়ের বানান-নীতির ওপর আলোকপাত করা হল—

১। লাতিন f এবং v-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য যথাক্রমে ফ় এবং ভ় লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয় ভাষায় ব্যবহৃত f এবং v-এর জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য। আমাদের মতে, উচ্চারণের যাথার্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে গিয়ে নতুন বর্ণের সমাবেশ এত সহজে সাধারণ্যে মান্যতা পাবে না। এসব ক্ষেত্রে আপোষরফা করে ফ এবং ভ লেখাই সংগত ছিল। এত পরিশ্রমের পরেও কিন্তু বিদেশি উচ্চারণ কখনোই বাংলা লিপিতে যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি স্বনিমের অসংখ্য মুক্ত বৈচিত্র্য (free variation) লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করা কার্যত অসম্ভব।

২। ইতোপূর্বে আমরা দেখিয়েছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে হস্‌-চিহ্ন ব্যবহারের অতিরিক্ত প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং ঢাকার বাংলা একাডেমির

বানানবিধিতে অনেকাংশেই কমে এসেছিল। উচ্চারণের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত হস্-চিহ্নের প্রকোপ আবার ফিরে এল আলোচ্যমান বইটিতে। শুধুমাত্র ফরাসি উচ্চারণের ক্ষেত্রেই দেখছি হস্-চিহ্নের অত্যধিক বাহুল্য। যেমন, ভি্ল্ (ville), জিদ্ (Gide), লাফ্র্গ্ (Laforgue) ইত্যাদি। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষণীয়।

৩। এত জটিলতা মেনে বানান লেখা প্রায় অসম্ভব। এমনকি স্বয়ং অভিধানকারের পক্ষেও তা সহজ কাজ নয়! সেই আত্যন্তিক পরিশ্রমজনিত জটিলতার দুয়েকটি নিদর্শন এরপর আমরা উল্লেখ করব। *একত্রিশ* পাতায় Freud বানান লেখা হচ্ছে ফ্রয়ড্। একই শব্দ যখন অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, তখন ফ-এর জায়গায় চলে এল ফ্ আর হস্-চিহ্ন লুপ্ত হল। লেখা হল : ফ্র্য়ড।[৩৮] বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক Jean-Luc Godard-এর নামের বানান আলোচ্যমান বইটি বলছে জাঁ্-লুক গদার। আবার সুভাষ ভট্টাচার্য লিখিত *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* মতে Jean Arthur Rimbaud-এর প্রথম নামের বানান : ঝাঁ।[৩৯] *সংসদ বিদেশি নামের অভিধান* জার্মান শব্দ Donner-এর লিপ্যন্তর করছে ডন্ন্যর্ অথবা ডন্ন্র! হরফের এই জটিলতা জনসমাজে প্রচলন ঘটানোর ক্ষেত্রে খুব বাস্তব-সংগত নয়।

সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহুভাষিক মেধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাস্তবে ব্যবহার্য হিসাবে এইসব বানানের গ্রহণযোগ্যতা কম।[৪০]

এতক্ষণ পর্যন্ত বিদেশি শব্দের বানান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নীতি আলোচনা করার পর আমাদের মূল সিদ্ধান্তগুলি নীচে লিপিবদ্ধ করা হল—

১। অ-ভারতীয় শব্দের ক্ষেত্রে লিপ্যন্তরের প্রবণতা ত্যাগ করে (অন্ত্যটীকা ৩৬ স্মর্তব্য) ধ্বনিগত রূপান্তর করাই শ্রেয়।

২। মূলানুগ উচ্চারণের দিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে বাংলার স্বাভাবিক লিখনরীতিকে ব্যাহত করা চলবে না। মূল উচ্চারণ বোঝানোর তাগিদে বাংলা লিপিতে অতিরিক্ত কোনো বর্ণের আমদানি করাও কাম্য নয়।

৩। বিদেশি শব্দের লিখনরীতির ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরকে বর্জন করা সম্ভব নয়। তবে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের সময় তা যেন বাংলা উচ্চারণের দলবিভাগের সঙ্গে মানানসই হয় (বর্তমান নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য), সেদিকে নজর রাখতে হবে।

৪। যে সব অ-ইংরেজি ভাষার শব্দের বিকৃত রূপ ইংরেজির মাধ্যমে বাঙালি প্রথম চিনেছে, তাদের বিকৃত রূপটিকেই প্রচলনের খাতিরে মান্যতা দেওয়া যেতে পারে। যেমন, অ্যারিস্টটল, বুলেভার্ড ইত্যাদি।

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্বভারতীয় রক্ষণশীলতা কিংবা সাহিত্য সংসদ/আনন্দবাজারীয় নিরীক্ষা-প্রবণতা—কোনোটাই কাম্য নয়। বানানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই শ্রেয়।

আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল একজন ফরাসি কবির নামের বানানকে কেন্দ্র

করে। এতক্ষণ পর্যন্ত নানা বানানবিধি পর্যালোচনার পর র‍্যাঁবো নাকি হ্র্যাঁবো—কোন্ বানানটি গ্রহণযোগ্য; তা বোধহয় আর বলে না দিলেও চলে। এই আলোচনায় বরং ইতি টানা যেতে পারে এক ফারসি কবির কথা বলে। রুমি লিখেছিলেন, 'ঠিক এবং ভুলের বাইরে এক প্রান্তর রয়েছে—সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।' ভাষাবিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, বানান ভুল বলে প্রায় কিছু হয় না। যে বানানটিকে ভুল বলা হচ্ছে, সে আসলে জনপ্রিয় কোনো বিধি মেনে চলছে না। এইটুকু মাত্র। ঠিক-ভুল বানানের ব্যাকরণগত জটিলতার বাইরে এক উন্মুক্ত মাঠে ভাষাতাত্ত্বিকদের সঙ্গে সাধারণ ভাষা-ব্যবহারকারীদের মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হোক।

অন্ত্যটীকা :

১। র‍্যাঁবো এবং হ্র্যাঁবোর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য সে প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে।

২। লক্ষণীয়, বইয়ের নামকরণে *সংসদ* শব্দটি থাকলেও এই বইকে আমরা লেখকের লিপ্যন্তর-বিষয়ক ব্যক্তিগত প্রস্তাব হিসাবেই গ্রহণ করতে চাই। কারণ, *সাহিত্য সংসদ* প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের বিদেশি নামের বানানে এই বইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। উচ্চারণের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে গিয়ে বানানের যে জটিল প্রস্তাব এই বইয়ে পেশ করা হয়েছে, তা সাধারণ্যে প্রচলিত হওয়া কিঞ্চিৎ মুশকিল বই-কি!

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানবিধির সর্বশেষ তথা তৃতীয় সংস্করণ (১৯৩৭) বর্তমান আলোচনার জন্য আমরা গ্রহণ করেছি।

৪। পরেশচন্দ্র মজুমদার : *বাঙলা বানান বিধি*। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১৪। পৃষ্ঠা - ১০২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির মুদ্রিত রূপ সুলভ না হওয়ায় আমাদের আলোচনায় এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত বানানবিধিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫। তদেব। পৃষ্ঠা - ১০২

৬। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। প্রথম খণ্ড। পৃষ্ঠা - ১০১২।

৭। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস : সংসদ বাংলা অভিধান। পৃষ্ঠা - ৩৬৩।

৮। সুভাষ ভট্টাচার্য : *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান*। আনন্দ পাবলিশার্স। চতুর্থ মুদ্রণ : অগস্ট, ২০১৩। পৃষ্ঠা ১০২।

৯। বাংলা একাডেমি *আধুনিক বাংলা অভিধান*। পৃষ্ঠা - ৫৭৯

১০। তদেব। পৃষ্ঠা - ৫৭৮

১১। কাজী রফিকুল হক (সম্পাদিত) : *বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*। বাংলা একাডেমি : ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৪। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০০৭। পৃষ্ঠা ১৬৩।

১২। গোলাম মুরশিদ (সম্পাদিত) : *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*। দ্বিতীয় খণ্ড। বাংলা একাডেমি : ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৩। পৃষ্ঠা - ১১৯৪।

১৩। রাজশেখর বসু : *চলন্তিকা : আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান*। সপ্তম সংস্করণ : সাল অনুল্লিখিত। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ। পৃষ্ঠা - ২২৫।

১৪। ৪ সংখ্যক তথ্যসূত্র। পৃষ্ঠা - ১০৪

১৫। https://www.etymonline.com/word/restaurant

১৬। ৪ সংখ্যক তথ্যসূত্র। পৃষ্ঠা - ১০৪।

১৭। তদেব। পৃষ্ঠা - ১০৩।

১৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দ্বিধাগ্রস্ততাকে ব্যঙ্গ করে সমীর সেনগুপ্ত একটি কাল্পনিক ট্রাফিক বিধি প্রণয়ন করেছিলেন—"সব গাড়ি রাস্তার বাঁদিক ধরে যাবে; তবে বাঁদিকে যদি বেশি ভিড় বা খানাখন্দ থাকে, তাহলে প্রয়োজনবোধে ডানদিক দিয়েও যাওয়া যাবে। রাজনীতিক, পুলিশ, উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা এবং মহামান্য বিচারকদের লাল বাতি জ্বালানো গাড়ি রাস্তার ডানদিক ধরে যেতে পারবে। সাধারণ আরোহীর খুব ব্যস্ততা থাকলে তিনিও ডানদিক দিয়ে যেতে পারবেন। তবে এই তালিকায় উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে, কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্টের লিখিত অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে। (বিঃ দ্রঃ কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট যদি কর্তব্যব্যপদেশে নিজের জায়গায় না থাকেন, তাহলে ট্রাফিক কনস্টেবলের অনুমতি নিলেই চলবে।...)"

উদ্ধৃতি আর দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে ব্যতিক্রম ও বিকল্প বানান বিষয়ে নমনীয় নীতি প্রসঙ্গে সুতীব্র ব্যঙ্গ এইটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নির্দেশ মানেই তো শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ নয়। ১৯৩৭ সালের নির্দেশ না মানার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও, ১৯৯৭ সালেই প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি কেন পরিত্যাজ্য, সেই বিষয়ে লেখক একটি শব্দও ব্যয় করেননি।

সেনগুপ্ত, সমীর ও বসু, সমীর (সম্পাদিত) ঃ *বাংলা বানান ঃ বিতর্ক ও সমাধান* (সেনগুপ্ত, সমীর ঃ নির্দেশ কেন মানি না)। পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ ঃ রাঁচি। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৭। পৃষ্ঠা - ৪৭।

১৯। পরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এই যুক্তিটি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৪ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা - ২৪-২৫।

২০। '...পেটকাটা 'এ' এখানে 'নিচু-এ' ধ্বনির জন্য বসেছে, পেটকাটা 'এ'-কার বসেছে ওই একই ধ্বনি ব্যঞ্জনের সাথে যখন আছে তখন।'

পাল, পলাশ বরন ঃ *ধ্বনিমালা বর্ণমালা।* কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ২০১৫। পৃষ্ঠা -৯২।

২১। (লেখক বা সম্পাদকের নাম অনুল্লিখিত) ঃ বানান ও বিন্যাস-বিধি। বিশ্বভারতী। প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ। 'ভূমিকা' অংশ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা - ৯।

২২। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৫।

২৩। কর্মশালার পরে শ্রীঅরুণ দে কয়েকটি প্রশ্ন লিখিত আকারে পেশ করেন যার উত্তরগুলি প্রস্তুত করে দেন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু। 'কিছু প্রশ্ন ও উত্তর' শিরোনামে তা প্রকাশ করা হল।'

তদেব। *প্রকাশকের নিবেদন* দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা - ৭।

২৪। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৬

২৫। তদেব। তত্রত্য।

২৬। ভট্টাচার্য, মিতালী; *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*। পারুল প্রকাশনী ঃ কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৭। পৃষ্ঠা - ২০২।

২৭। (সম্পাদক বা লেখকের নাম অনুল্লিখিত) ঃ *বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ঃ কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৫। সুপারিশ ১.৪০ থেকে ১.৪৪ দ্রষ্টব্য।

২৮। তদেব। সুপারিশ ২.৪১ এবং ২.৪২ দ্রষ্টব্য।

২৯। (সম্পাদক বা লেখক অনুল্লিখিত) ঃ *বাংলা একাদেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম*। বাংলা একাডেমি ঃ ঢাকা। পরিমার্জিত সংস্করণের প্রথম পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০১৫। নিয়ম ২.১০ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা - ২২।

৩০। তদেব। নিয়ম ২.৬ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা - ২০।

আমাদের মূল আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক নয় বলে অন্ত্যটীকায় উল্লেখ করা হচ্ছে, ক্রিয়াপদের বানানের ক্ষেত্রেও একাডেমি কখনও কখনও এইরকম ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ৫.১০ সংখ্যক নিয়মে হ ধাতুর ক্ষেত্রে বানান প্রস্তাব করা হচ্ছে 'হলো'। অথচ, ৫.২ সংখ্যক নিয়মে কর্ ধাতুর ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বানান 'করল'। আরও দেখানো যায়—কাট্ ধাতুর ক্ষেত্রে 'কাটল' (নিয়ম ৫.৩), কিন্তু খা ধাতুর ক্ষেত্রে 'খেলো' (নিয়ম ৫.৪), দি ধাতু ক্ষেত্রে 'দিলো' (নিয়ম ৫.৫), দৌড়া ধাতুর ক্ষেত্রে 'দৌড়াল' (নিয়ম ৫.৬) ইত্যাদি। অনুমান করা যায়, যেখানে একই বানানের অন্য কোনো শব্দ রয়েছে (খেল=খ্যাল, দিল=হৃদয়, হল=লাঙল ইত্যাদি), সেইসব ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপে ও-কার ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে, আমাদের মতে, এই পরিমাণে ব্যতিক্রমকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা বিধি তৈরির উদ্দেশ্যকেই নষ্ট করে। কোনো একটি বাক্যে ব্যবহৃত 'হল' বানান 'হইল' বোঝাচ্ছে নাকি 'লাঙল'; তা নিয়ে সত্যিই কখনও বিভ্রান্তি তৈরি হবে বলে মনে হয় না। সেইরকম বিরল কোনো পরিস্থিতির আশঙ্কায় অকারণ মান্য বানানবিধিকে জটিল না করাই শ্রেয়।

৩১। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ ঃ *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ঃ কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ২০০০। বানানবিধি ২৮.ঘ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা - ১৯।

৩২। তদেব। পৃষ্ঠা - ১০৮।

৩৩। সরকার, পবিত্র ঃ *তবে তো শশীবাবুতেও ই-কার দেওয়া দরকার*। *আনন্দবাজার পত্রিকা*। ২২ এপ্রিল, ২০১৭।

https://www.google.co.in/amp/s/www.anandabazar.com/amp/editorial/bengali-spelling-now-and-then-1.601198

৩৪। হক, মাহবুবুল; শরিফ, সাজ্জাদ প্রমুখ (সম্পাদিত) ঃ *প্রথম আলো ভাষারীতি*। প্রথমা প্রকাশন ঃ ঢাকা। পঞ্চম সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। পৃষ্ঠা - ১৬।

৩৫। তদেব। তত্রত্য।

৩৬। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৭।

মূল আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এই বানানবিধির আরও দুটি উল্লেখযোগ্য অসংগতির

কথা অন্ত্যটীকায় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এই বইয়ের *শব্দের প্রয়োগ ভিন্নতা* নামক অধ্যায়ে *উল্লেখিত* শব্দটিকে 'উল্লেখ করা হয়েছে এমন' অর্থে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রয়োগ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। আর নির্বিশেষ অর্থবোধক বাক্যের উদাহরণ হিসাবে লেখা হচ্ছে ঃ 'কি ছেলে কি বুড়ো, সবাই এক কথা বলছে।' এক্ষেত্রে *কি* যেহেতু হ্যাঁ/না-বাচক প্রশ্নবোধক বাক্যে ব্যবহৃত নয়, তাই *কী লেখাই* সংগত ছিল।

৩৭। ভট্টাচার্য, সুভাষ (সম্পাদিত) ঃ *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ*। সাহিত্য সংসদ ঃ কলকাতা। চতুর্থ মুদ্রণ ঃ ২০১৭। গ্রন্থের প্রারম্ভে *বিদেশি নামের উচ্চারণ ঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা* নামক অংশ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-*চোদ্দো-সাতাশ*।

৩৮। তদেব। পৃষ্ঠা - ৬৩।

৩৯। তথ্যসূত্র ৮ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা - ১৬৪।

৪০। বাস্তবে ব্যবহার্য বিদেশি শব্দের বানান-নীতির জন্য দ্রষ্টব্য—

সরকার, পবিত্র ঃ *বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা* ('বিদেশি শব্দের বাংলা লিপ্যন্তর' নামক প্রবন্ধ)। দে'জ পাবলিশিং ঃ কলকাতা। প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ ২০০৪। পৃষ্ঠা ৯৪-১১০।